গেলাস

নিত্য নতুন কত কিম্ভূত সব খবর ছাপছে কাগজে। সর্বরোগ-হরা রুটি, তুলসী-খেকো সন্ন্যেসী, মহাশূন্য থেকে অদ্ভুত সব প্রাণীদের মর্ত্যে অভিযানের প্রাক্‌সূচনা। ঘর্মাক্ত-মস্তক সাংবাদিকের উর্বর-মস্তিষ্ক-সঞ্জাত ফসলের ভিড়ে আজকের টুকরো খবরটা এমন কিছু আহামরিত্বের দাবী রাখেনা। কিন্তু গৌরহরিবাবু কিছুতেই চোখ সরাতে পারেন না কাগজের এই অংশটুকু থেকে। কোন অদৃশ্য চুম্বক যেন ধরে রাখে তাঁর সমগ্র মনোযোগটাকে।

খবরটা এই :-

"আজব গেলাসের তাজ্জব আজও অনুদ্‌ঘাটিতই রয়ে গেছে। সম্প্রতি লুসানের একটি বিচিত্র আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত নানা আশ্চর্য বস্তুর সমাহারের মাঝে যে জিনিসটি দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ বিস্মিত করেছে তা হ'ল ভারত সরকারের তরফ থেকে প্রেরিত একটি গেলাস। অপূর্ব দীপ্তিময় এই গেলাসটি বিশবছর আগে প্রত্নতস্করের কাছ থেকে . রাজস্থান পুলিশের হস্তগত হয়। কিন্তু বহু গবেষনা-অনুসন্ধান করেও এর উৎপত্তির হদিশ পাওয়া যায়নি। এ ধরনের গেলাসের কোনও নিদর্শন নাকি বিশ্বের লিখিত ইতিহাসে নেই। এমন কি গেলাসটা যে কোন ধাতুতে নির্মিত বিশেষজ্ঞেরা তাও নির্ণয় করতে পারেন নি কেউ।

গৌরহরিবাবু চশমাজোড়া চোখ থেকে খুলে কোঁচার অগ্রে বেশ করে মুছে আবার চোখে দিলেন। বারবার পড়া খবরটা আরও একবার পড়লেন। তারপর কাগজটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সমুখের পানে। তাঁর মনে হ'ল বিগত বছরগুলো যেন তাঁর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে এক এক করে। অচিরে বিশ বছর আগের

দিনগুলোয় ফিরে গেলেন তিনি ----।

যৌবনে গৌরহরিবাবু ঘোর আদর্শবাদী ছিলেন। দেশ ততদিনে শোষণকারীর চঙ্গুলমুক্ত হয়ে গেছে। যুগযুগান্তের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে চিরনির্যাতিত নিপীড়িত ভারত। করণীয় আর কিছু বাকি নেই, অন্যেরা সব কাজ আগেভাগেই করে ফেলেছে এই চিন্তায় কাবু হ'লেন না গৌরহরিবাবু। কোমর বেঁধে গঠনমূলক কাজে নেমে পড়লেন তিনি। আর গঠনমূলক কাজ বলতে স্বাস্থ্য এবং চরিত্র গঠনের চেয়ে শ্রেয় আর কি হ'তে পারে? গৌরহরিবাবু তেতলার ছাদে ব্যায়ামের আখড়া খুললেন, বিলাসব্যসন এবং বিবাহ বিরোধী প্রচার চালাতে লাগলেন তাঁর চেনাপরিচিত এবং বন্ধুমহলে। ইতিমধ্যে চাকরির খাতিরে কোলকাতা ছেড়ে সুদূর রাজস্থানে পাড়ি দিতে হ'ল তাঁকে। কারণ, রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'ননি গৌরহরিবাবু এবং পুরোপুরি "দেশহিতায় জনহিতায় চ" নিজেকে উৎসর্গ করার সাধ থাকলেও সে সাধ্য তাঁর ছিল না। তিনি যেটুকু করতেন তা অফিসের কাজের ফাঁকেফিকিরেই করতে হ'ত তাঁকে।

ভীলওয়ারাতে এসে প্রমাদ গুনলেন তিনি। বলতে ভুলে গেছি যে গৌরহরিবাবু দেশের কল্যাণার্থে অনেক কিছু ত্যাগ করলেও মাছটা ছাড়তে পারেন নি। বরং তিনি বলতেন যে নিরামিষত্বের প্রতি গুরুত্ব দিয়েই মারাত্মক ভুল করেছেন এ দেশের মুনি - ঋষি - গুরুদেবরা। শাকপাতা ফলমূল খেয়ে কোন জাতি বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারেনা যদি না সেই সঙ্গে মাছ - মাংস - ডিমে খাদ্যের ভারসাম্য বজায় থাকে। এদেশে জমির অভাব, লোকাধিক্য। হাঁস-মুর্গী ছাগল-ভেড়া পালনের সুযোগ কম এবং সে সব যোগানো জনসাধারণের সাধ্যাতীত। সাধারণ মানুষের জন্যে হ'ল মাছ। দেশের তিনদিক ঘিরে গভীর টলটলে জল আর তাতে ঠাসা আছে অনাস্বাদিত খাদ্যসম্ভারের অফুরান ভাণ্ডার। নৌকো, ট্রলার পাঠাও। ছিপ - বঁড়শি - জাল ফ্যালো। মাছ ধরো আর খাও। মাছের প্রোটিনে ব্রেন বাড়বে, দৃষ্টিশক্তি বাড়বে, শরীরে পুষ্টি হ'বে। জাপানের মত ক্ষুদে একটা বামন যদি মাছ খেয়ে রুশ-দৈত্যের দাড়ি উপড়োতে পারে ভারত যে একদিন সারা বিশ্বকে মুঠোয় পুরবে তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই। শুধু মাছ চাই। প্রচুর মাছ ----।

কিন্তু ভীলওয়ারার বাড়িওলারা গৌরহরিবাবুর যুক্তি শুনতে নারাজ।

নাকে কাপড় দিয়ে বলে, "নেহী বাবুজী, মছলি নেহী চলেগা। দুধ - দহি - ঘিউ খাকর সেহত বনাও। য়হাঁ পর মছলি নেহী চলেগা।"

ছ'মাসে বার চারেক বাড়ি বদলে নাজেহাল হয়ে গেলেন। সব জায়গাতেই গৃহকর্তার সেই এক বুলি, "মছলি নেহী চলেগা।" ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন ভুক্তভোগী বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর। মাছেরঝোল ভাতের সংস্থান করতে সুদূর প্রবাসে এসে মাছের বিরুদ্ধে ঢালাও ফরমানে বিব্রত বিমর্ষ তারাও। মরিয়া হ'য়ে সবাই মিলে জনার্দন লজে মেসবাড়ির পত্তন করলেন। অবশ্য গৌরহরিবাবুই যে মূল উদ্যোক্তা তা বলা বাহুল্য। খোদ কোলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে বামুন ঠাকুর এলো। পদে বামুন হ'লেও মেসের বাবুদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি সর্ব কর্মই ক্রমে ক্রমে ভজহরির স্কন্ধে এসে বর্তালো। এবং তা নিয়ে ভজহরিকে এতটুকু ক্ষুন্ন হ'তে দেখা গেল না, কারণ তার সব খাটা-খাটুনি গুণগ্রাহী বাবুরা দরাজ দাক্ষিণ্যে পুষিয়ে দিত। এছাড়া বাবুদের গৃহিনীহীন বারোয়ারী সংসারে ভজহরির কাজেকর্মে ছিল অবাধ স্বাধীনতা।

বছর তিনেক নির্বিঘ্নে কেটে গেল। জনার্দন লজের সভ্য সংখ্যা তখন ডজন পুরতে চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ চাকুরে, কেউ ছাত্র, কেউ বা স্বাধীন জীবিকাধারী জীব। হঠাৎ দুদিনের কালো মেঘ ছেয়ে এলো তাদের নির্ঝঞ্ঝাট আকাশ জুড়ে। গৌরহরিবাবু বিশবছর আগের ঘটনা-পরম্পরাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। গোপাল মুখার্জি বর্ধমানে লম্বা ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলো এবং ফেরার ক'দিন পরেই পড়লো বেদম জ্বরে। এরপর মেসে একজন দু'জন করে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক্তার বললো, ম্যালেরিয়া। তখন দিল্লী, পাঞ্জাব, হিমাচল সবই ম্যালেরিয়ার আওতায় এসে গিয়েছে। জলের অভাব হ'লে মশারও অভাব হ'বে এই চিরাচরিত কিংবদন্তী অপ্রমান করে রাজস্থানের শুষ্ক মরুপ্রদেশেও তার জয়ডঙ্কা শোনা যাচ্ছে নানা এলাকায়। কাজেই বর্ধমানের মশকবৃদ্ধিই যে জনার্দন লজের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানীর মূল উৎসবিন্দু একথা হলপ করে বলা যায়নি সেদিন। বললেও গোপাল মুখার্জি মানতে রাজী হ'ত না কোনমতেই। এবং মেসবাসীরা ক্লোরোকুইনের গুণে ত্বরায় সেরে ওঠায় এ নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি কেউ।

এর মাসখানেক পর গৌরহরিবাবুর আহারে অরুচি দেখা দিলো। শীতের প্রকোপেও সেবার বড্ড কাহিল হয়ে পড়লেন উনি। ক্রমে ক্রমে বেশ দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল তাঁকে। নানা ওষুধপত্তর ও আন্দাজে ঢিল মেরে হপ্তাকয়েক কাটার পর রক্ত পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়ার বীজানু পাওয়া গেল তাতে। এ নাকি এক নতুন রকমের ছদ্মবেশী ম্যালেরিয়া। ধরন-ধারণ সবই আলাদা। নিত্য নতুন কড়া কড়া ওষুধ যেমন আবিষ্কার হ'চ্ছে অসুখগুলোও বেশ-বাস বদলে নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসছে আরও মারাত্মক হয়ে। ডাক্তারের মতে গৌরহরিবাবুর রোগ বেশ ভালকরে শিকড় গেড়ে বসেছে। চিকিৎসাও সময় নেবে। গৌরহরিবাবু লম্বা ছুটি নিয়ে শয্যাশায়ী হ'লেন। নিজের ঘরটুকুর বাইরে বেরোনোর শক্তি নেই। চৌকি থেকে উঠতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যান। আড়ষ্ট বিস্বাদ জিভে খাবার ঠেকাতে চান না। উপরোধে পড়ে এবং জীবনরক্ষার তাগিদে জোর-জার করে যেটুকু গলাঃধকরণ করেন তার সবটুকুই গলা ঠেলে বেরিয়ে আসে। একমাত্র ওষুধের বড়িগুলোই যা পেটে থাকে তাঁর।

চিকিৎসা শুরু হ'বার ক'দিন পরের কথা। চতুর্থ না পঞ্চম দিন সেটা ঠিক মনে নেই গৌরহরিবাবুর। রাত্রি আটটা কি ন'টা হ'বে। পাশের বড় ঘরে সবাই খেতে বসেছে। ভজহরি পরিবেশন করছে। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন তিনি। তাঁর মাথাটা কেমন ঝন্‌ঝন্‌ করতে থাকে। পাশের ঘরের আওয়াজগুলো ইঁট পাটকেলের মত তাঁর মাথার অভ্যন্তরে কোথাও যেন আঘাত করতে থাকে ক্রমাগত। নিঃসাড়ে চোখ বুঁজে পড়ে থাকেন তিনি। শরীরটা কেমন যেন হালকা লাগে তাঁর। মনে হয় তিনি যেন চৌকিসুদ্ধু ভেসে চলেছেন। পাশের ঘর থেকে আসা আওয়াজ ক্রমে দূর হ'তে দূরতর হ'তে থাকে। বন্ধ চোখের সামনে অন্ধকার আবছা হ'য়ে আসে। কি একটা দেখতে পান যেন।

বিরাট একটা স্ক্রীনের মত, কিংবা একটা প্রকাণ্ড দেয়াল। তাতে অনেকগুলো ফাটল ফুটে উঠেছে। গৌরহরিবাবু যেন আর শুয়ে নেই। বাহন চৌকিটাকে ছেড়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে নীচে নেমে একটা ফাটলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ভিতর দিকে চোখ ফেলে দেখতে পাচ্ছেন। বিরাট জমজমে সভা। সেকি জাঁকজমক তার!

মনুষ্যাকৃতি বিরাটকায় কারা সব বসে রয়েছে। কি সুন্দর সাজ পোষাক তাদের! কানে রত্নখচিত কুণ্ডল, হাতে সুবর্ণ বলয়। বৃষস্কন্ধ বেয়ে নেমে এসেছে কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম। বলিষ্ঠ বাহুগুলিতে মণিময় অঙ্গদের বন্ধনে ফুটে উঠেছে তরঙ্গায়িত মাংসপেশী। সর্বাঙ্গ হ'তে নানাবর্ণের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। সে আলোকচ্ছটার সামনে চন্দ্রাতপতলে ঝাড়লণ্ঠনগুলো যেন ম্লান, অধোবদন হয়ে আছে নিজেদের অপ্রয়োজনীয়তার লজ্জায়।

সভাপতি ভাষণ শেষ করেছেন এইমাত্র। হাততালি দিচ্ছে সবাই। সভার অন্যপ্রান্তে ঠুংঠাং করে আশ্চর্য সব বাজনায় আওয়াজ তুলছে ভীমকায় বাজনদারেরা। ঘুঙুরপরা পরমা সুন্দরী রূপসীরা ধীরভাবে অপেক্ষা করছে পরবর্তী অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্যে। বাজনা বেজে উঠলো। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশালকায় প্রৌঢ় গায়ক মুখব্যাদান করে প্রবল ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে গান আরম্ভ করতেই গৌরহরিবাবু তড়িৎ বেগে ফাটল ছেড়ে সরে এলেন। পর পর আরও কয়েকটা ফাটল বাদ দিয়ে তারপর আবার আর একটায় চোখ রাখলেন।

মুহূর্তে তাঁর সর্বশরীর কণ্টকিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। অকল্পনীয়া, অনির্বচনীয়া ষোড়শী সুন্দরীর পদ্মপলাশ পদপ্রান্ত চুম্বনরত প্রেমাকাঙ্খী মহাতেজ মহারথী। কন্যার সলাজ প্রত্যাখ্যানে সাদর আমন্ত্রণের রেশ। মহারথী পেলব লঘু পক্ষীশাবকের মত ষোড়সীকে তাঁর মণিদীপ্ত দুই মহাভুজে ধারণ করে স্বর্ণপর্যঙ্কপানে এগিয়ে চললেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কন্যা মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষীণ আর্তনাদ করে ফাটলের পানে তর্জনী নির্দেশ করলো। তখন সেই জোতির্ময় পুরুষ ষোড়সীর অঙুলি-নির্দিষ্ট দিকে ধীরে ধীরে মুখ ফেরালেন। গৌরহরিবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল তাঁর। পর্যঙ্কপাশে রাখা রত্নখচিত একটা গেলাস তুলে নিয়ে তিনি সজোরে গৌরহরিবাবুর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন।

"বাপ রে!" বলে আর্তনাদ করে ছিটকে সরে এলেন গৌরহরিবাবু। তাঁর চিৎকার শুনে খাবার ঘর থেকে ভজহরি ছুটে এলো এবং তার পিছন পিছন অন্যরাও। গৌরহরিবাবু তখন চৌকির পাশে মাটিতে পড়ে আছেন। কপাল বেয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। এঁটো হাতে ধরাধরি করে ওঁকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল সবাই। ভজহরি ডেটল এবং তুলো

নিয়ে এলো। মাথায় পটি লাগিয়ে বাতাস করতে লাগলো।

খানিকপর চোখ চেয়ে তাকালেন গৌরহরিবাবু। অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "ও কে? মেনকা, না রম্ভা?"

ভজহরি বললো, "আজ্ঞে দাদাবাবু, আমি ভজহরি।"

গৌরহরিবাবু সমবেত মেসবাসীদের মুখের উপর স্তিমিত দৃষ্টি বুলিয়ে আবার চোখ বুঁজলেন।

এরপর গভীর রাত্রে তাঁকে ঘরময় হামাগুড়ি দিতে দেখা যায়। চৌকি এবং বাক্স-তোরঙ্গ রাখার বেঞ্চিটার নীচে আঁতিপাঁতি করে কে জানে কি খুঁজতে গিয়ে পাশের ঘরের ত্রিদিব চক্রবর্তীর নজরে পড়ে যান গৌরহরিবাবু । ত্রিদিব চক্রবর্তী রাত জেগে এ.এম.আই.ই. পরীক্ষার জন্যে প্রাণপাত করছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ গৌরহরিবাবুকে ঐ অবস্থায় দেখে ভড়কে গিয়ে অন্যদের ডেকে আনেন। গৌরহরিবাবুর ম্যালেরিয়া মারাত্মক মোড় নিয়েছে অনুমান করে সেই রাতদুপুরেই পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে নিয়ে আসেন তাঁরা। তাঁর দেওয়া সিডেটিভ খেয়ে অচিরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন গৌরহরিবাবু। ওষুধের গুণেই হোক অথবা দুর্বলতাজনিত হোক এর পরের ক'টা দিন আচ্ছন্নতার মধ্যেই কাটে তাঁর। কাজেই জনার্দন মেসের নতুন বিপত্তির খবরটা তখুনি পান না তিনি। বেশ ক'দিন পরে, সুস্থ সবল হয়ে ওঠার পর সমস্ত ব্যাপারটা যখন খোলসা করে সবাই মিলে খুলে বলে তাঁকে উনি একেবারে থ'হয়ে যান।

ভজহরি নাকি মেস ছেড়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে কোলকাতাগামী কোনও ট্রেনের কামরায় বামাল পুলিশের কবলে পড়েছে। ভজহরি নাকি যে-সে লোক নয়, কোন আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীদলের কেউকেটা একজন এবং তার কাছে পাওয়া মালের দাম যে কত লাখ টাকা পুলিশদপ্তর এখনও তার হিসেব কষতে ব্যস্ত। ক্রমে এ খবর কাগজে কাগজে ছাপা হতে থাকে বড় বড় হরফে। পুলিশের তারিফে-ভরা বিবৃতি, চিঠিপত্র, এবং অভিনন্দন-সভার ধুম পড়ে যায়। ভজহরিকে এবং তার কাছে পাওয়া আজব গেলাস শনাক্ত করতে জনার্দন মেসের লোকদেরও ডাক পড়ে। আশ্চর্য সুন্দর দীপ্তিময় গেলাসটি দেখে সবার তাক লেগে যায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সবাই। কেবলমাত্র গৌরহরিবাবুই কিছু বলেন না। গুম্ মেরে বসে থাকেন। শূন্যদৃষ্টি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন বুঝি কোন অদৃশ্য ফাটলের পানে।

বিশ বছর পরে আজও খবরটি পড়ে সেই একই ভাবান্তর দেখা যায় তাঁর। চশমাজোড়া খুলে পকেটে পুরে অদেখা চোখে সামনের পানে চেয়ে কপালের সেই পুরোনো, মিলিয়ে আসা ক্ষতচিহ্নটায় হাত বোলাতে থাকেন অন্যমনস্ক ভাবে।